প্রশান্তচিত্ত মুমিনের ভাবনা

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

বইটির পটভূমি

এবার (২০০৭) ইংল্যান্ড সফরে ম্যানচেস্টারে ইসলামিক ফোরামের পক্ষ থেকে একটা বিশেষ সমাবেশ করা হয়। ফোরামের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর দিলদার আহমদ চৌধুরী পরামর্শ দিলেন যে, এমন কিছু নসীহত করুন, যাতে আমাদের সংগঠনের সবাই উদ্বুদ্ধ হয় ও প্রেরণা পায়। ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর ম্যানচেস্টার শাখার দায়িত্বশীল আবদুল্লাহিল মুমিন আযমীও অনুরূপ দাবি জানাল।

ভেবে-চিন্তে 'প্রশান্তচিত্ত মুমিনের ভাবনা' শিরোনামে একটি সিনপ্‌সিস্ তৈরি করে সমাবেশে উপস্থিত নারী-পুরুষ সবার কাছে পৌঁছাতে বললাম।

আলোচনার সময় ভূমিকায় বললাম, বিষয়টা সম্পর্কে কারো ধারণা হতে পারে যে, শ্রোতাদের জন্য এটা 'হাই ডোজ' হয়ে যাবে। মুমিনের ভাবনা তো অবশ্যই অত্যন্ত উচ্চ মানের হওয়া প্রয়োজন। আমার গন্তব্য কতদূর, তা জানা না থাকলে সেখানে পৌঁছার প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চলবে না। মুমিন হিসেবে আমাদের ভাবনা কেমন হওয়া আবশ্যক তা-ই আলোচনা করতে চাই, যাতে সেই মানে উন্নীত হওয়ার প্রেরণা জাগ্রত হয়। মুমিন আযমী নিজেই গোটা আলোচনা ভিডিও করে রাখল।

লন্ডনে 'দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে' তাদের দায়িত্বশীলদের সমাবেশে আমাকে দাওয়াত দিলেন। বিষয় সম্পর্কে আমার পরামর্শ চাইলে আমি কয়েকটা সিন্‌পসিস্ দিলাম। তাঁরা এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করলেন বলে সেখানেও এ বিষয়েই আলোচনা করলাম।

কুরআন মাজীদ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ .

'এই (কুরআন) মানবজাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট সাবধানবাণী এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।' (সূরা আলে ইমরান : ১৩৮)

অর্থাৎ সকলের উদ্দেশ্যেই কুরআন পাঠানো হয়েছে বটে, কিন্তু সবাই এ থেকে হেদায়াত ও উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম নয়।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় শুধু তাদের জন্যই উপযোগী হতে পারে, যারা ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনবিধান বলে বিশ্বাস করে, যারা ইসলামকে বিজয়ী করার সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা বড় ফরয মনে করে এবং এ উদ্দেশ্যে গঠিত সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়াও ফরয বলে স্বীকার করে।

আল্লাহ তাআলা এ পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য পূরণ করুন।

গোলাম আযম

বাইতুল কুরআন মসজিদ, মগবাজার, ঢাকা।

২৭ রমাদান, ১৪২৮ হিজরী

৯ অক্টোবর, ২০০৭ ঈসায়ী

www.priyoboi.com

সূচিপত্র

মানুষের দেহ
রূহের পরিচয়
নাফস ও রূহের লড়াই
আল্লাহর ওলী
কালবে সালীম
প্রশান্তচিত্ত মুমিনের মনোভাব
দুনিয়ার নিয়ামত সম্পর্কে ভাবনা
আল্লাহর সেরা নিয়ামত
দাওয়াত ইলাল্লাহ
আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে মুমিনের ভাবনা
রাসূল (স)-এর সাথে মুমিনের গভীর মহব্বতের অনুভূতি
কুরআনের সাথে মুমিনের সম্পর্ক
নামাযের সাথে মুমিনের সম্পর্ক
দুনিয়ার মঙ্গল সম্পর্কে মুমিনের ভাবনা
প্রশান্তচিত্ত মুমিনের দৃঢ় মনোবল
যা অর্জন করা মুমিনের টার্গেট

www.priyoboi.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রশান্তচিত্ত মুমিনের ভাবনা

মানুষের দেহ

মানুষের দেহটি আসল মানুষ নয়। দেহ সৃষ্টির বহু আগেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআনের ভাষায় যাকে রূহ (رُوْحٌ) বলা হয়, সেটাই আসল মানুষ। বাংলা ভাষায় একে বিবেক বলা যায়। দেহ হলো বস্তুসত্তা– পশুর মতোই এর কোনো নৈতিক চেতনা নেই। ভালো ও মন্দের চেতনাই হলো রূহ। রূহ হলো নৈতিক সত্তা।

মানুষ ও পশুর দেহ যেসব উপাদানে সৃষ্ট তা সবই বস্তু। স্বাভাবিক কারণেই দেহ বস্তুজগৎকে ভোগ করতে চায়। খিদা লাগলে খাবার চায়, পিপাসা হলে পানি চায়, গরম লাগলে ঠাণ্ডা চায়, ঠাণ্ডার সময় গরম চায়, মিষ্টি আওয়াজ শুনতে চায় ইত্যাদি। দেহের এসব দাবিকে কুরআনে এক শব্দে নাফস (نَفْسٌ) বলা হয়েছে। বাংলায় এর নাম প্রবৃত্তি, প্রবণতা, স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি।

খিদের সময় দেহ খাবার দাবি করে। যেহেতু দেহের নৈতিক চেতনা নেই, সেহেতু হারাম পথে পেলেও সে খায়। কিন্তু হারাম খাবার সে যত মজা করেই খাক, বিবেকের কাছে তা মজা লাগে না। বিবেক দংশন করে। কারণ, এর নৈতিক চেতনা আছে।

রূহের পরিচয়

প্রথম মানুষ আদম (আ)-কে মাটি দিয়ে তৈরি করার পর আল্লাহ তাআলা তাঁর রূহ থেকে আদম (আ)-এর দেহে ফুঁ দিয়ে যে নৈতিক চেতনা দান করেছেন, তা-ই হলো আসল মানুষ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ -

'আমার রূহ থেকে এর মধ্যে ফুঁ দিয়ে দিলাম।' (সূরা হিজর : ২৯)

এ রূহ বস্তু নয়। দেহের টান বস্তুজগতের দিকে। রূহের আকর্ষণ আল্লাহর দিকে। এ আকর্ষণ আছে বলেই কোনো কোনো মানুষ দেহের দাবিকে অগ্রাহ্য করে সন্ন্যাসী হয়ে যায়।

সূরা আ'রাফের ১৭২ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে সকল মানুষের রূহকে বের করে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন,

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ - قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا -

'আমি কি তোমাদের রব নই? সবাই জবাব দিল, অবশ্যই আপনি আমাদের রব, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।' আল্লাহকে রব হিসেবে সাক্ষ্যদাতা রূহই হলো আসল মানুষ।

সৃষ্টির দিক দিয়ে সব মানুষের বয়সই এক সমান। দেহের উপর আরোহণ করে মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের বয়সই অপরের থেকে কম-বেশি হয়।

নাফস ও রূহের লড়াই

আমাদের সবারই এ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে যে, দেহ যাকিছু দাবি করে এর মধ্যে নৈতিক বিবেচনায় যদি মন্দ কিছু থাকে তাহলে বিবেক আপত্তি জানায়। ফলে নাফস ও রূহের মধ্যে লড়াই লেগে যায়। নাফস যদি রূহের চেয়ে বেশি সবল হয় তাহলে নাফস বিজয়ী হয় এবং দেহ যা চায় তা পেয়ে যায়, যা করতে চায় করে ফেলে। রূহ যদি বেশি সবল হয় তাহলে নাফসকে দমন করতে সক্ষম হয় এবং দেহকে মন্দ কাজ করা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। নাফস ও রূহের এ লড়াইয়ের কারণে নাফসের তিন রকম অবস্থা হয়। কুরআনে ঐ তিন অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে– নাফসে আম্মারা, নাফসে লাওয়ামা

www.priyoboi.com

ও নাফসে মুৎমাইন্না।

১. নাফসে আম্মারা– হুকুমকর্তা নাফস। এর এত দাপট যে, সে রূহকে পাত্তাই দেয় না। এ অবস্থায় রূহ এমন দুর্বল থাকে যে, বেচারা নাফসকে বাধা দিতে মোটেও সক্ষম নয়। তাই নাফস বিনা বাধায় তার সকল দাবি পূরণ করতে থাকে। যে লোকের নাফসের এ অবস্থা, সে লোকের ঈমানই নেই। আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান থাকলে এ অবস্থা হতে পারে না।

২. নাফসে লাওয়ামা– তিরস্কৃত নাফস। এটি নাফসে আম্মারার মতো রূহের উপর প্রভাব খাটাতে পারে না এবং এতটা সবলও নয়। রূহ তাকে বাধা দেয়, আপত্তি জানায়, তিরস্কার করে। ফলে নাফস ও রূহের মধ্যে লড়াই চলে। কোনো সময় নাফস জয়ী হয়, কোনো সময় রূহ জয়ী হয়। যার জয় হয় তার দাবিই পূরণ হয়। যে লোকের নাফসের এ অবস্থা তার মধ্যে অবশ্যই ঈমান আছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اِذَا سَرَّتْـكَ حَسَنَـتُـكَ وَسَاءَتْـكَ سَيِّـئَـتُـكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ ـ

‘যখন তোমার কোনো ভালো কাজে তোমার খুশি লাগে এবং তোমার কোনো মন্দ কাজে তোমার মনে খারাপ লাগে তখন বোঝা গেল যে, তুমি মুমিন।’

ঈমান থাকলে রূহের দুর্বলতার কারণে নাফস মন্দ কাজ করতে সক্ষম হলেও বিবেক দংশন করে। দেহ মন্দ কাজে মজা পেলেও ঈমানদারের মন খুশি হয় না।

আল্লাহ তাআলা ঈমানদারের রূহকে সবল করার উদ্দেশ্যে নামায-রোযার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে রূহ নাফসকে মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। আল্লাহর ভয়েই রোযাদার দিনের বেলায় দেহের অনেক দাবি পূরণ করে না। খিদা লাগলেও গোপনে খায় না। অন্য কারো ভয়ে নয়; একমাত্র আল্লাহর ভয়েই সে দেহের দাবি পূরণ করে না।

জীবনের সব দিকেই যে আল্লাহর দেওয়া শরীআত যত বেশি মেনে চলে তার রূহ তত বেশি সবল হয় এবং যে পরিমাণ সবল হয় ঐ পরিমাণেই সে নাফসকে মন্দ থেকে ফেরাতে পারে।

৩. নাফসে মুৎমাইন্না– প্রশান্ত নাফস। নাফসের এ অবস্থা তখনই হয়, যখন রূহ নাফসের উপর শতকরা একশ’ ভাগ জয়ী হয়। যখন রূহ এতটা শক্তিশালী হয় যে, নাফসকে সম্পূর্ণরূপে দমন করতে সক্ষম, তখন নাফস এমন কোনো দাবি জানাতে আর সাহস পায় না, যা মেনে নিতে রূহ আপত্তি করতে পারে। নাফস তখন প্রশান্ত হয়ে যায়, রূহের সাথে আর লড়াই করতে চেষ্টা করে না।

যার নাফসের এ অবস্থা, সে মানুষ আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেছেন তা পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করে এবং যাকিছু নিষেধ করেছেন, সেসব কিছু থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। তার মন অস্থির নয়। সে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকে। সে আপদে-বিপদেও আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে থাকে। এ মানের মানুষের চিত্তই প্রশান্ত, এমন মানুষই প্রশান্তচিত্ত মুমিন।

আল্লাহর ওলী

কুরআনে এ মানের মুমিনকেই আল্লাহর ওলী বলা হয়েছে। সকল মুমিনই আল্লাহর দাস বা গোলাম। আল্লাহর দাসের দু’রকম মান রয়েছে। সাধারণ মানের মুমিনদেরকে ‘ইবাদুল্লাহ’ বলা হয়। আর উন্নত মানের মুমিনকে ‘আওলিয়াআল্লাহ’ উপাধি দেওয়া হয়েছে।

ওলী শব্দের বহুবচন আওলিয়া। ওলী শব্দটি আল্লাহ তাআলা নিজের জন্যও ব্যবহার করেছেন : اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
‘আল্লাহ মুমিনদের ওলী।’ (সূরা বাকারা : ২৫৭)

আবার সূরা ইউনুছের ৬২ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণ নেই।’ এ আয়াতে মানুষকে ওলী বলা হয়েছে।

ওলী শব্দের অর্থ বন্ধু– সাহায্যকারী, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক। এ শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহার করলে অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষকই বোঝায়। মানুষের জন্য ব্যবহার করা হলে আল্লাহর প্রিয়, স্নেহভাজন, আদরের দাস বোঝায়। আল্লাহ স্নেহপরায়ণ প্রভু, আর মানুষ একান্ত স্নেহভাজন দাস। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ـ

‘(হে নবী!) বলে দিন, হে আমার ঐসব বান্দাহরা! তোমরা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।’ (সূরা যুমার : ৫৩)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা গুনাহগারদেরকে তাঁর দাস বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর ওলী, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ করেন না। ভুল বা কোনো দুর্বলতার কারণে গুনাহ হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহর ওলীই প্রশান্তচিত্ত মুমিন। কে কে এ মানের দাস, তা আল্লাহই শুধু জানেন। ‘অমুক ব্যক্তি আল্লাহর ওলী’– এমন সার্টিফিকেট দেওয়া সমীচীন নয়। কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর ওলী মনে করে মহব্বত করা যেতে পারে; কিন্তু প্রকাশ্যে ওলী বলে প্রচার করা ঐ ব্যক্তির জন্যই ক্ষতিকর।

কালবে সালীম

সূরা সাফফাতের ৮৪ নং আয়াতে ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে,

اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ـ

“তিনি তাঁর রবের সামনে ‘কালবে সালীম’ নিয়ে হাজির হন।”

তাফহীমুল কুরআনে মাওলানা মওদূদী (র) তাঁর লেখা টীকায় কালবে সালীমের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

‘বিশুদ্ধচিত্ত বা সঠিক ও নিষ্কলুষ অন্তর। আকীদাগত ও নৈতিক দিক থেকে সকল ত্রুটিমুক্ত মন। এমন মন, যেখানে কুফরী ও শিরকী এবং সন্দেহমূলক কোনো ধারণার লেশমাত্র নেই; যার মধ্যে নাফরমানীর সামান্যতম প্রবৃত্তিও নেই। কোনো কুটিলতা ও জটিলতা নেই। অসৎ প্রবণতা ও অপবিত্র কামনা-বাসনার কোনো প্রভাব নেই। কারো বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ ও অকল্যাণ কামনা পাওয়া যায় না এবং নিয়তে কোনো রকম ত্রুটি ও কৃত্রিমতা নেই।’

‘কালবে সালীম’-এর অনুবাদ সুস্থ মন। সালীম শব্দের অনেক অর্থ আছে– নিরাপদ, সঠিক, অটুট, অক্ষত, পূর্ণাঙ্গ, সুস্থ ইত্যাদি। কালবে সালীমের অধিকারী ব্যক্তি অবশ্যই প্রশান্তচিত্ত।

প্রশান্তচিত্ত মুমিনের মনোভাব

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে প্রশান্তচিত্ত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন, স্বাভাবিক কারণেই সকল বিষয়েই তাদের মনোভাব এমন উন্নত, যা সকলের জন্য অনুকরণযোগ্য হওয়ার কথা। বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁদের ভাবনা কেমন হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই, যাতে পাঠক-পাঠিকাগণের ভাবনা এর আলোকে গড়ে ওঠে এবং তারা প্রশান্তচিত্তের অধিকারী হওয়ার প্রেরণা লাভ করেন।

আখিরাতে কামিয়াবী হাসিল করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর কতক মুখলিস বান্দাহ আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ এবং রাসূল (স)-এর আনুগত্যের প্রতি এত নিষ্ঠার পরিচয় দেন যে, জনগণ তাদেরকে আল্লাহর ওলী হিসেবে ভক্তি করে। কিন্তু রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা) সকল বাতিল শক্তির মুকাবিলা করে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার যে দায়িত্ব পালন করলেন, সে দায়িত্ববোধই তাদের মধ্যে নেই। নিঃসন্দেহে তাঁরা অত্যন্ত নেক লোক; কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের নেকী তেমন কোনো অবদান রাখতে পারে না। অবশ্য তাদের মধ্যেও প্রশান্তচিত্ত মুমিন হয়তো আছেন।

www.priyoboi.com

আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশে এমন একটি ইসলামী আন্দোলন কর্মতৎপর রয়েছে, যে আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষিত ও মাদরাসা শিক্ষিতদের চমৎকার সমন্বয় রয়েছে। তারা এ দেশকে একটি ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে গড়তে চায়। তাদের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল নেই, স্বার্থের হানাহানি নেই। তারা দুর্নীতি থেকে আত্মরক্ষা করা কর্তব্য মনে করে। ব্যক্তিগত জীবনে তারা নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত হওয়ার চেষ্টায় রত। তারাই এ দেশে ইসলামের আশা-ভরসার স্থল। তাদের উদ্দেশ্যেই আমার এ লেখা।

আল্লাহর দুয়ারে ধরনা দিয়ে আছি, যাতে তারা সবাই প্রশান্তচিত্তের অধিকারী হয়। যে ভাবনা প্রশান্তচিত্ত মুমিনের থাকার কথা এ উদ্দেশ্যেই তা আলোচনা করছি, যাতে তাদের মধ্যে এসব ভাবনা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। এ দিক দিয়ে এ আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত, তারাই সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়।

দুনিয়ার নিয়ামত সম্পর্কে ভাবনা

প্রশান্তচিত্ত মুমিনের দৃষ্টিতে দীন ও ঈমান এমন মহান নিয়ামত, যা দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে ব্যাপ্ত এবং যার শুকরিয়া আদায় করা দুনিয়ায় শেষ হবে না বলে বেহেশতে গিয়েও শুকরিয়া জানাতে হবে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করব। এখন দুনিয়ার নিয়ামত সম্পর্কে লিখছি।

প্রশান্তচিত্ত মুমিন জানে যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ-মুসীবত আসে না। আর এসব আসে পরীক্ষা হিসেবে। প্রতিটি পরীক্ষাই প্রমোশনের সোপান। তাই তারা বিপদে পেরেশান না হয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সাধনা করে। সে হিসেবে এসবও নিয়ামত হিসেবে গণ্য। কিন্তু মুমিন কখনো মুসীবত কামনা করে না। মুসীবত যাতে না আসে, সে জন্য দু'আ করতে থাকে।

মুমিন আল্লাহর নিকট দুনিয়ার যেসব নিয়ামত কামনা করে তা নিম্নক্রম অনুযায়ী উল্লেখ করছি :

১. দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত হলো সুস্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে ইবাদাতও করা যায় না। সুস্বাস্থ্য আল্লাহর মহাদান। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে সব দায়িত্বই পালন করা সম্ভব হয়। স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য স্বয়ং স্রষ্টা যে স্বাস্থ্যবিধি দান করেছেন তা অমান্য করে স্বাস্থ্যহারা হলে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আবেগপ্রবণ হয়ে রাত-দিন অবিরাম কাজ করলে সমাজ বাহবা দিতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্যহারা হলে নিজেই অকর্মণ্য হতে বাধ্য হবে। আমার স্বাস্থ্যের যত্ন আমাকেই নিতে হবে। এ কাজটি করার দায়িত্ব অন্য কারো নয়। বিশেষ করে খাদ্য ও বিশ্রাম গ্রহণের রুটিন সযত্নে মেনে চলতে হবে।

২. দ্বিতীয় প্রধান নিয়ামত হলো সচ্ছলতা। স্বাবলম্বী হয়ে হিসাব করে চললে এবং শুধু আল্লাহর কাছে ভিখারি হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে কারো কাছে তিনি হাত পাততে দেন না। যে অন্যের কাছে হাত পাতে, তাকে আল্লাহ স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেন না।

৩. সমমনা জীবনসাথী– মুমিন ও মুমিনা যদি দাম্পত্য জীবনে দীন ও দুনিয়ার দিক দিয়ে সমমনা সাথী পান, তাহলে দুনিয়ার জীবনে পরম শান্তি ভোগ করতে সক্ষম হন। এর ব্যতিক্রম হলে অশান্তির সীমা থাকে না। এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই জীবনসাথী অত্যন্ত সাবধানতা ও যত্নের সাথে তালাশ করতে হবে এবং মহান মাবুদের নিকট ধরনা দিতে হবে।

৪. সন্তোষজনক সন্তান– মুমিন দম্পতি তাদের সন্তানদের স্বভাব, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার যদি এমন পান, যাতে তাদের চোখ জুড়ায় ও কলিজা ঠাণ্ডা হয়, তাহলে এ নিয়ামতের কোনো তুলনা হয় না। এর ব্যতিক্রম হলে মর্মজ্বালার শেষ নেই।

সন্তানরা বিনা চেষ্টায় চোখ জুড়ানোর মতো হয়ে গড়ে উঠবে না। ইসলামী আন্দোলনে ব্যস্ততার অজুহাতে তাদেরকে গড়ে তুলতে অবহেলা করা যাবে না। আল্লাহর রহমতে ইসলামী আন্দোলনের বদৌলতে এমন শিশুসংগঠন এবং ছাত্র ও ছাত্রীসংগঠন রয়েছে, যাদের সাথে সন্তানদেরকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এতে সামান্য অবহেলা করা হলে পরে আফসোস করা ছাড়া কোনো লাভ হবে না। ব্যর্থ পিতামাতার গ্লানি ভোগ করতে বাধ্য হতে হবে।

www.priyoboi.com

৫. নিজস্ব বাড়ি– যে মানের বাড়িই হোক, নিজের একটা বাড়ি থাকাও বড় নিয়ামত। গ্রামে যাদের নিজের বাড়ি আছে, তাদেরকে শহরে ভাড়া বাড়িতে থাকতে হয়, তারাও বাড়িহীন নয়।

সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতে মানুষের ভালোবাসার পাত্র হিসেবে যে আটটির তালিকা দেওয়া হয়েছে, এর একটি হলো বাড়ি বা বাসস্থান।

৬. শুভাকাঙ্ক্ষী ভাই-বোন– মুমিন অবশ্যই তার ভাই-বোনের সঙ্গে এমন আচরণ করবে, যাতে তারা শুভাকাঙ্ক্ষী হয়। আপন ভাই-বোনের মধ্যে যদি মধুর সম্পর্ক না থাকে তাহলে এটা অত্যন্ত বিব্রতকর। পিতার মৃত্যুর পর শরীআতমতো সম্পত্তি বণ্টন করা হলে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় না। মুমিনকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে।

৭. সৎপ্রতিবেশী– বাসস্থানের আশপাশে যারা থাকে, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা খুবই জরুরি। সুখে-দুঃখে তাদের নিকট থেকে আত্মীয়সুলভ আচরণ পেলে এটা অবশ্যই নিয়ামত মনে হয়। ঝগড়াটে মনোভাবের প্রতিবেশীর বাড়াবাড়ি এড়িয়ে চলা ছাড়া উপায় থাকে না।

৮. আন্তরিক সহকর্মী– কর্মক্ষেত্রে যাদের সাথে মেলামেশা চলে তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারলে শান্তিময় পরিবেশে কাজ করা যায়। এমন পরিবেশও বড় নিয়ামত।

৯. সহমর্মী আত্মীয়-স্বজন। আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ রাখলে, তাদের সুখে-দুঃখে শরীক হলে, প্রয়োজনে সহায়তা করলে তাদেরকে সহমর্মী হিসেবে পাওয়া যায়। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট করা কবীরা গুনাহ। আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখার জন্য ইসলাম জোর তাকীদ দিয়েছে। এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে বললেন, 'আমার এক আত্মীয় আমার সাথে মন্দ আচরণ করেছে। আমি কেমন করে তার সাথে সম্পর্ক রাখব?' রাসূল (স) জবাবে বললেন, 'তোমার সাথে যারা ভালো ব্যবহার করে তাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখতে চেষ্টার প্রয়োজন হয় না; যে মন্দ আচরণ করে তার সাথেই সম্পর্ক বহালের চেষ্টা করতে হয়।'

১০. নিঃস্বার্থ বন্ধু-বান্ধব আল্লাহর বড় নিয়ামত। এমন বন্ধু-বান্ধব জোগাড় করার দায়িত্ব মুমিনেরই। আল্লাহর ওয়াস্তে দীনের স্বার্থে যদি মানুষের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা হয় তাহলে তারাও নিঃস্বার্থ বন্ধু-বান্ধবে পরিণত হয়।

এসব নিয়ামত হাসিল করার ভাবনা মুমিনের থাকা উচিত। এ বিষয়ে সজাগ থাকলে এসব নিয়ামত দুনিয়ার জীবনকে মধুময় করতে পারে।

আল্লাহর সেরা নিয়ামত

দীন, ঈমান ও হেদায়াত লাভ করার চেয়ে বড় কোনো নিয়ামত নেই। দুনিয়ার উপরিউক্ত সকল নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার দায়িত্ব দুনিয়ার জীবনেই সমাধা করা সম্ভব। কিন্তু দীন, ঈমান ও হেদায়াতের শুকরিয়া বেহেশতে গিয়েও আদায় করতে হবে বলে আল কুরআনের সূরা আ'রাফের ৪৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ـ

'(বেহেশতবাসীরা বলবে) সব প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে এ পথ দেখালেন। যদি আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত না করতেন, তাহলে আমরা নিজেরা এ পথ (কিছুতেই) পেতাম না।'

বোঝা গেল যে, বেহেশতবাসীরা তাদের এ সৌভাগ্যের জন্য নিজেদের কৃতিত্ব দাবি করবে না, তারা বিনয়ের সাথে আল্লাহর মেহেরবানীর কথাই স্বীকার করবে।

প্রশান্তচিত্ত মুমিন দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দেওয়া এ শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের বাস্তব পন্থা নিয়ে যে ভাবনা করে তা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। মুমিন চিন্তা করে দেখে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যেভাবে সরাসরি পথ দেখান, আমাকে তো সেভাবে পথ দেখান না। তাহলে আমি কেমন করে এ পথের সন্ধান পেলাম? আল্লাহর কোনো বান্দাহ আমাকে দীনের দাওয়াত দিয়েছে, আমাকে দীনের বই পড়তে দিয়েছে, আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, আমার মনের খটকা দূর করার চেষ্টা করেছে, আমার হেদায়াতের জন্য আমার পেছনে লেগে রয়েছে, তার উসীলায় আমি এ পথ চিনতে পেরেছি এবং

www.priyoboi.com

এক সময় দয়াময় মাবুদ আমার মনের কপাট খুলে দিয়েছেন– রাসূল (স)-এর সময় থেকে এভাবেই দীনের দাওয়াত ছড়িয়েছে। যে-ই দাওয়াত গ্রহণ করেছে তার উপরই অপরকে দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব এসে পড়েছে।

দাওয়াত ইলাল্লাহ

দাওয়াত ইলাল্লাহ'র গুরুত্ব বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা বেশি ভালো হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলিম।' (সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩৩)

আসমানের নিচে ও জমিনের উপরে দাওয়াত ইলাল্লাহর চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ কোনো কাজ নেই।

১. এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই নবী-রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছে। যারা এ কাজে আত্মনিয়োগ করে তারা তাঁদেরই উত্তরাধিকারী।

২. যারা এ কাজ করে, তারা এর কোনো বদলা দুনিয়ায় পেতে চায় না। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের কামিয়াবী হাসিলের উদ্দেশ্যেই তারা এ কাজ করে। দুনিয়ার অন্য সব কাজের সুফল মানুষ দুনিয়ায়ই পেতে চায়; কিন্তু এ কাজের সুফল দুনিয়ায় কামনা করা হয় না।

৩. দায়ী ইলাল্লাহ আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে যার কাছে যায় তার কাছে কিছু চাইতে যায় না; তাকে মহা মূল্যবান কিছু দিতে যায়। একজন দায়ী তার চেয়ে ধনে, জনে, প্রভাবে, মর্যাদায় যত বড় লোকের নিকটই যায়, সে লোকের অন্তরে সম্মানের আসনই পায়। কারণ সে বুঝতে পারে যে, দায়ী তার কাছে কিছু চাইতে যায়নি, তাকে কিছু দিতে গিয়েছে।

মুমিনের প্রিয়তম কাজই হলো পথহারা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা। কোনো পথহারা লোক যার চেষ্টায় পথে আসে, তার উপর আল্লাহ কত খুশি হন তা বোঝানোর জন্য রাসূল (স) চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণটি নিম্নরূপ–

এক পথিক উট নিয়ে সফরে গেল। এক মরুদ্যানে বিশ্রাম নিয়ে জেগে দেখে, উট নেই। খাদ্য ও পানি উটের পিঠে ছিল। বহু তালাশ করেও উট না পেয়ে মৃত্যু অনিবার্য মনে করে হতাশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হুঁশ ফিরে এলে দেখতে পেল যে, উট হাজির। খুশির চোটে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানাতে গিয়ে উল্টো বলে ফেলল, 'হে আল্লাহ তুমি আমার দাস, আমি তোমার রব।' এ হতাশ লোকটি উট ফিরে পেয়ে যেমন খুশি হয়েছে, আল্লাহ তার পথহারা বান্দাহকে পথে ফিরে পেয়ে এর চেয়েও বেশি খুশি হন।

আল্লাহ তাআলার এমন সন্তুষ্টির মতো মহাসম্পদ পেয়ে মুমিন আর কী আশা করতে পারে। তাই দাওয়াত ইলাল্লাহই মুমিনের প্রিয়তম কাজ।

আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে মুমিনের ভাবনা

মুমিনের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কেমন তা আল্লাহ স্বয়ং সূরা নাসে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ ও মানুষের ইলাহ। যে ঈমান আনে তার সাথেই আল্লাহর এ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং মুমিন সচেতনভাবে এ সম্পর্ক অনুভব করে। এ তিন রকমের সম্পর্কের ব্যাপারে প্রশান্তচিত্ত মুমিনের ভাবনা নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ আমার রব। রব মানে লালন-পালনকারী, রক্ষণা-বেক্ষণকারী ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণকারী। মায়ের পেটে ভ্রূণ অবস্থায় থাকার সময় থেকে এ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আমাকে সবসময় লালন-পালন করে চলেছেন। জন্মের সাথে সাথে মায়ের বুকে আমার জন্য দুধের ব্যবস্থা করেছেন। মা আমার মুখে খাবার তুলে দেন বটে, কিন্তু আমার রব হজম করার ব্যবস্থা করেন। নিঃশ্বাস বন্ধ হলেই সব শেষ। প্রতিটি নিঃশ্বাস তাঁর দান। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেলেই মৃত্যু। প্রতি মুহূর্তে তিনিই আমার রব।

www.priyoboi.com

যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তার রবও আল্লাহই। কিন্তু সে তা অনুভব করে না। তার সে চেতনাবোধ নেই। আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। 'দমে দমে তনু মনে' তাঁকে অনুভব করি। তাঁকে ভুলে যাওয়া মানে নিজের সত্তাকেই হারিয়ে ফেলা।

ওহীর মাধ্যমে তিনি নিজেকে সর্বপ্রথম রব হিসেবেই আমার নিকট পরিচয় দিয়েছেন। ওহীর প্রথম আয়াতই হলো :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ 'তোমার সৃষ্টিকর্তা রবের নামে পড়।'

সূরা ফাতিহা প্রথম অবতীর্ণ পূর্ণ সূরা। এতেও রাব্বুল আলামীন হিসেবে পরিচয় দিলেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে যত দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে তাঁকে রাব্বানা (আমাদের রব) বলে সম্বোধন করার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল (স) সুসংবাদ দিয়েছেন যে, বান্দাহ যখন নামাযে সিজদায় যায়, তখন সে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে পৌঁছে যায়। তখন বেশি করে মনিবের নিকট চাওয়ার সুযোগ নিতে হবে। সিজদায় তাসবীহ পড়ার সময় سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى (আমার মহান রব পবিত্র) বলার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তিনি কি আমার একার রব? তিনি তো রাব্বুল আলামীন। আমার রব না বললে নৈকট্য বোধ হয় না। শিশু বলে, 'আমাল আম্মু'– এটাই নৈকট্য প্রকাশের ভাষা।

মায়ের মমতার কথা মনে হলে মনের গভীরে দোলা লাগে। মাকে কি ভোলা যায়? মায়ের হৃদয়ে এ মমতা যিনি দিলেন, তার মায়া-মমতার কি সীমা আছে? হাদীস থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলার মনে যে রহম (দয়া) আছে এর ১০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র তিনি জীবজগতে বিলি করে দিয়েছেন। আমার সে মহান রবের কথা মনে হলে অনেক গভীর দোলা অনুভব করা উচিত।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ ۔

'নিশ্চয়ই সাচ্চা মুমিন তারা, যাদের মন আল্লাহর কথা শুনলে কেঁপে ওঠে।' (সূরা আনফাল : ২)

এ আয়াতটি থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর সাথে ভালোবাসার গভীরতার দরুন আল্লাহকে স্মরণ করার সময় মুমিনের মনে দোলা অনুভূত হয়। সত্যিকার মুমিন আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। আল্লাহ বলেন, اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ 'যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর জন্য তাদের মহব্বত অত্যন্ত বেশি।' (সূরা বাকারা : ১৬৫)

২. আল্লাহ আমার বাদশাহ। আমি তাঁর রাজ্যে বাস করি। এ রাজ্যের বাইরে যাওয়ার কোনো সাধ্য আমার নেই। এ রাজ্যে সুখ-শান্তি ভোগ করতে হলে আমার বাদশাহ যাতে আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন, সে বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। তিনি অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো কাজ আমি কখনো করতে পারি না।

সুখ-শান্তি চায় না এমন কোনো মানুষ নেই। সবাই যে শান্তি চায়, তা কি পায়? কিভাবে চললে সুখ-শান্তি পাওয়া যায় সে কথা আমার বাদশাহ বলে দিয়েছেন। সে কথা মেনে না চললে কেমন করে সুখ-শান্তি পাবে?

প্রত্যেকেই যাকিছু করে, নিজের মঙ্গলের নিয়তেই করে। নিজের অমঙ্গলের উদ্দেশ্যে কেউ কাজ করে না। এমনকি যে আত্মহত্যা করে, সে-ও নিজের মঙ্গল মনে করেই করে। নিজের মঙ্গলের সহীহ নিয়ত তার অবশ্যই আছে; কিন্তু সে কেবল হিসাবে ভুল করেছে। কিসে মঙ্গল তা সে জানে না। আমার বাদশাহ মঙ্গলের যে পথ দেখিয়েছেনদ্দ একমাত্র ঐ পথেই সুখ-শান্তি পাওয়া যায়।

৩. আল্লাহ আমার ইলাহ। ইলাহ মানে মাবুদ। আবদ মানে দাস। যাঁর দাস তিনিই মাবুদ। দাসের কাজ হলো মনিবের হুকুম পালন করা। মাবুদ মানে মনিব বা হুকুমকর্তা। হুকুমকর্তা আরো আছে; কিন্তু তারা প্রভু নয়। তাই ইলাহ মানে হুকুমকর্তা প্রভু। ইলাহ শব্দের অর্থ পূর্ণ করতে হলে হুকুমকর্তা শব্দের আগে একমাত্র শব্দ বসাতে হবে। আল্লাহ আমার 'একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু।' لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কালেমাতে আমি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছি যে, আমি শুধু তাঁর হুকুম মেনে চলব; তাঁর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম মানব না। আমি শুধু তাঁরই দাস। অন্য কারো দাসত্ব আমি করতে পারি না। জীবন দিয়ে হলেও এ নীতি মেনে চলব।

আমার উপর হুকুম করার অধিকার আমার মাবুদ যাদেরকে দিয়েছেন, তাদের হুকুম যদি তাঁর হুকুমের বিরোধী না হয় তাহলে অবশ্যই মানব। কারণ, আমার প্রভুই তা মানতে হুকুম করেছেন। তাঁর হুকুমের বিরোধী অন্য সবার হুকুম অমান্য

www.priyoboi.com

করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূল (স)-এর সাথে মুমিনের গভীর মহব্বতের অনুভূতি

মুমিন অত্যন্ত আবেগের সাথে উপলব্ধি করে যে, আল্লাহর দীনের মহানিয়ামত রাসূল (স)-এর মাধ্যমেই এসেছে এবং তাঁর গোটা জীবনটাই ইসলামের বাস্তব জীবন্ত রূপ। তাঁর জীবনই আসল কুরআন। তাঁর আনুগত্যই আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায়। আল্লাহ তাকেই ভালোবাসেন, যে তাঁর রাসূল (স)-কে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুন্দরতম আদর্শ হিসেবে অনুকরণের চেষ্টা করে।

মুমিন রাসূল (স)-কে একজন মানুষ হিসেবেই বিশ্বাস করে; তাঁকে মানবসত্তার ঊর্ধ্বে কোনো অতিমানব মনে করে না; তবে অবশ্যই তাঁকে মহামানব, শ্রেষ্ঠ মানব, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও আল্লাহর বন্ধু মনে করে। তিনিই একমাত্র মানুষ, যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যাবশ্যক। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুমিনের জীবনে যাকিছু করণীয়– সবই রাসূল থেকেই শিখতে হয়। তাঁর শিক্ষাই দুনিয়ার জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের জন্য তাঁর শিক্ষাই একমাত্র নির্ভুল, ভারসাম্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ।

মৃত্যুর পর কবরে যে কয়টি প্রশ্ন করা হবে, এর মধ্যে একটি হলো মুহাম্মদ (স)-কে রাসূল বলে জান কি না? হাশরের কঠিন ময়দানে হাউজে কাউছারের পানি তাঁর হাত থেকে পেতে হবে। তাঁর শাফা'আত পাওয়ার সৌভাগ্য হলেই মুক্তি পাওয়া সহজ হবে। এভাবে আখিরাতেও তিনি মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক।

তাই মুমিন তাঁকে নিজের চেয়ে, পিতা-মাতা-সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি মহব্বত করে। তাঁর প্রতি দরূদ পেশ করার সময় গভীর অনুভূতিতে মুমিনের অন্তর সিক্ত হয়। মুমিন এ বিষয়ে সচেতন যে, এ মহব্বতের দাবি পূরণ করতে হলে প্রতি পদে পদে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। তা না হলে মহব্বতের সত্যিকার প্রমাণ হয় না।

কুরআনের সাথে মুমিনের সম্পর্ক

মুমিনের নিকট কুরআনের প্রতি প্রবল আকর্ষণের আসল কারণ এটাই যে, পৃথিবীতে কুরআনই একমাত্র রাব্বুল আলামীনের বিশুদ্ধ বাণী। পূর্ববর্তী কোনো বাণীই সংরক্ষিত নেই। আরবী ভাষায় নাযিল হওয়া এ বাণী সামান্যও বিকৃত হয়েছে বলে প্রমাণ করার সাধ্য কারো নেই।

মুমিন যখন কুরআন তিলাওয়াত করে তখন অন্তরে শিহরণ জাগে যে আল্লাহর বাণী উচ্চারণের পরম সৌভাগ্য তার হয়েছে। এ কুরআন তার জন্যই নাযিল হয়েছে, তাকে সম্বোধন করেই কথা বলছে। মনে হয় যেন, আল্লাহ স্বয়ং তার সাথে কথা বলছেন।

আমার রব! বাদশাহ ও ইলাহ আমাকে সম্বোধন করে যে বাণী পাঠালেন তা জানার জন্য মুমিন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। কুরআন বোঝা তার নেশায় পরিণত হয়। কুরআন বুঝতে পারলে মুমিন এমন তৃপ্তি বোধ করে, যার কোনো তুলনা নেই। রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং দু'আ করেছেন,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ رَبِيْعُ قَلْبِىْ وَنُوْرَ بَصَرِىْ وَجَلَاءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ -

'কুরআন দ্বারা আমার কালবকে সজীব করো, কুরআনকে আমার চোখের আলো বানাও, আমার দুঃখ-বেদনা দূর করো এবং আমাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দাও।' এসব অর্জনের জন্য মুমিনকে ব্যাপকভাবে কুরআন চর্চা করতে হয়। এ চর্চা করা হলে আখিরাতে কুরআন আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে বলে হাদীসে আছে বিধায় কুরআন বোঝার উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নামাযের সাথে মুমিনের সম্পর্ক

মুমিনের নিকট নামায সবচেয়ে প্রিয় আমল। স্নেহপরায়ণ রবের নৈকট্য লাভের জন্য নামায সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। ঘুম থেকে ওঠার পর নামাযই মুমিনের প্রথম আমল। এর পূর্বে পেশাব-পায়খানা, ওযূ-গোসল তো নামাযেরই প্রস্তুতি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহকে ভুলতে দেয় না। কুরআনে আছে, اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ 'আমাকে স্মরণ রাখার উদ্দেশ্যে নামায

কায়েম কর।'

মুমিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করে। নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকার বাইরে কিছুই করে না। নামায তাকে শিক্ষা দিল যে, নামাযের বাইরেও সব কাজ আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করতে হবে। এ দেহটি দিয়ে যে কাজই করানো হয় ঐ নিয়মেই করাতে হবে। এভাবে চলার অভ্যাস করতে থাকলে নামাযে যে ট্রেনিং দেওয়া হয় তা বাস্তবে নামাযের বাইরেও চালু হবে। এভাবেই জীবনে নামায কায়েম হয়। মসজিদে নামায পড়া হয় মাত্র। কুরআনে নামায কায়েম করতে হুকুম করা হয়েছে। দুই ওয়াক্তের মাঝখানে দুনিয়ার কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকাকালে নামাযের ট্রেনিং ঢিলা হয়ে যায়।

তাই বারবার নামাযে হাজির হয়ে ট্রেনিংকে ঝালাই করতে হয়। নামায বাইরের জীবন থেকে সম্পর্কহীন নয়। নামাযের প্রভাব যেমন নামাযের বাইরের জীবনে পড়ে, নামাযের বাইরের জীবনের প্রভাবও নামাযের উপর পড়ে। নামাযের বাইরে যদি এমন কিছু করা হয়, যা করা উচিত ছিল না, তাহলে এর প্রভাবে নামাযের সময় মনোযোগ নষ্ট হয় এবং শয়তান ঐসব কথা নামাযের মধ্যে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মুমিন নামাযে যখন যা পড়ে ও করে তখন মনটাকে খালি থাকতে দেয় না। কখন মনে কী ভাবনা থাকা উচিত তা সে জেনে নেয় এবং নামাযের বাইরের ভাবনা মনে যাতে না আসে সে দিকে সতর্ক থাকে। শয়তান নামাযকে বিনষ্ট করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। সে মুমিনকে নামায থেকে তো কখনো ফিরিয়ে রাখতে পারে না; কিন্তু মনটাকে নামাযের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় রত থাকে। কুচিন্তা তো মুমিন গ্রহণ করে না। তাই নামাযের বাইরের সুচিন্তা মনে ঢুকিয়ে হলেও নামাযকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অপচেষ্টা চালায়। শয়তানের সরবরাহ করা সুচিন্তাও মুমিন গ্রহণ করে না। নামাযে শয়তানের সাথে মুমিনের যুদ্ধ সাময়িক নয়, স্থায়ী ও অবিরাম।

মুমিন ফজরের নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় তার মনটাকে মসজিদে ঝুলিয়ে রেখে যায়। তাই বাইরে কর্মরত থাকাকালে যোহরের নামাযের খেয়াল হারায় না। এভাবে প্রত্যেক নামাযেই যথাসময়ে মসজিদে হাজির হতে সক্ষম হয়। হাশরের কঠিন দিনে যখন আল্লাহর রহমতের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, তখন যারা ঐ ছায়ার নিচে আশ্রয় পাবে বলে রাসূল (স) ঘোষণা করেছেন, তাদের মধ্যে এমন নামাযীরাও থাকবে, যাদের মন মসজিদে ঝুলন্ত থাকে।

হাদীসে নামাযকে 'আল্লাহর সাথে গোপন আলাপ' বলা হয়েছে। মুমিন যখন নামাযরত থাকে, তখন সে যা কিছু বলে একমাত্র আল্লাহর সাথেই বলে, অন্য কারো সাথে নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে অবশ্যই বিরত রাখে।' কিন্তু সকল নামাযীর জীবনে কি এ কথা সত্য? আল্লাহর কথা তো অবশ্যই সত্য। তাহলে বুঝতে হবে যে, নামাযী হয়েও যারা অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকে না, তাদের নামাযে আসলেই ক্রটি রয়েছে। তাদের নামায জীবন্ত নয়, মৃত। যাদের নামায জীবন্ত, তাদের নামায অবশ্য তাদেরকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম। কারণ, আল্লাহর কথা মিথ্যা হতে পারে না। এ বিষয়ে আমার লেখা 'জীবন্ত নামায' বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

যার নামায জীবন্ত, সে নামাযের স্বাদ উপভোগ করে। তাই সে রুকূ'-সিজদা অত্যন্ত ধীরে ধীরে আদায় করে। নামাযে কোনো সময় তাড়াহুড়া করে না। রুকূ'র পর স্থির হয়ে দাঁড়ায়, হুট করে সিজদায় চলে যায় না। দুই সিজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসে হাদীসে শেখানো দু'আ পড়ার পর আবার সিজদায় যায়। অত্যন্ত ইতমিনানের সাথে মুমিন নামায আদায় করে।

পূর্ণ তৃপ্তির সাথে নামায আদায় করার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে এত সময় পাওয়া যায় না। জামায়াতে নামাযের সময় তো ইমামের সাথেই নামায শেষ করতে হয়। মসজিদে অবশিষ্ট নামায বেশি সময় লাগিয়ে আদায় করলে অন্যরা দেখবে– এতে রিয়ার আশঙ্কা আছে। তাই মজা নিয়ে দীর্ঘ সময় নামাযে মহান মাবুদের সাথে গোপন সংলাপের জন্য শেষরাতে তাহাজ্জুদের নামাযই সেরা অবলম্বন।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'ফরয নামাযের পর সেরা নামায হলো শেষ রাতের নামায।' দু'আ কবুলের সেরা সময় হলো শেষ

www.priyoboi.com

রাত ও ফরয নামাযের পর।’

এ বিষয়ে চমৎকার একটি হাদীস নিম্নরূপ :

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَّكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ -

‘রাতে দাঁড়ানো তোমাদের কর্তব্য। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের তরীকা, তোমাদের রবের নৈকট্য, আগের গুনাহর কাফফারা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার উপায়।’ (তিরমিযী)

দীনকে বিজয়ী করার ব্যাপারে মুমিনের ভাবনা

আল্লাহ তাআলা যে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সে মহান উদ্দেশ্য সফলভাবে পূরণের জন্য বাস্তব শিক্ষা দানের জন্যই নবী-রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছে। সে দায়িত্বটি হলো খিলাফতের দায়িত্ব। কুরআন মাজীদ বিভিন্ন ভাষায় এ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, ইকামাতে দীন, দীনকে বিজয়ী করা ইত্যাদি একই মর্ম প্রকাশ করে।

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য বিধান দিয়েছেন। এসব বিধান তিনি নবীর মাধ্যমে পাঠাননি। তাঁর বিধান তিনি নিজেই জারি ও চালু করেন। কোনো সৃষ্টিই সে বিধান অমান্য করতে পারে না। সবাই বাধ্য হয়ে সে বিধান মেনে চলে।

মানুষের জন্য যে বিধান তিনি নবীর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন, তা তিনি অন্যান্য সৃষ্টির বিধানের মতো নিজে জারি ও চালু না করে তাঁর পক্ষ থেকে মানবসমাজে জারি করার জন্য নবী ও নবীর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন। মানুষের জন্য রচিত বিধান (দীন) আল্লাহ সরাসরি জারি করেন না। এ বিধান তো এমনিতেই জারি হবে না। তাহলে এ দায়িত্ব কে পালন করবে?

তাই আল্লাহ তাআলা এ দায়িত্ব নবী-রাসূলগণের উপর দিয়েছেন। দীনকে কায়েম করাই তাঁদের আসল দায়িত্ব। দীন কায়েম হলে আল্লাহর সকল হুকুমই কায়েম হওয়ার সুযোগ হয়। তাই দীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করাই সকল ফরযের বড় ফরয। আমাদের দেশে দীন বিজয়ী নয় বলে নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাতের মতো বড় বড় ফরযগুলোও ফরযের মর্যাদা পাচ্ছে না। এসবই মুবাহ অবস্থায় আছে। যার ইচ্ছা সে করবে, না করলে কোনো দোষ ধরা যায় না। দীন বিজয়ী হলে এসব ফরয যথাযথ মর্যাদা পায়।

দীনকে বিজয়ী করার কাজটি নবী-রাসূলের পক্ষে একা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা কোনো অযোগ্য মানুষকে নবী-রাসূল বানাননি। কিন্তু যত যোগ্যতাই থাকুক, কাজটি এমন যে, অনেক লোক সমবেতভাবে চেষ্টা করা ছাড়া এ দায়িত্ব পালন একেবারেই অসম্ভব। তাই নবীগণের দাওয়াত যারা কবুল করেছেন তাদেরকে তারা সংগঠিত করেছেন। শেষ নবী ১৩ বছরে এ সংগঠিত শক্তি গড়ে তোলার পর মদীনায় দীন বিজয়ী হয়েছে।

দীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা সবচেয়ে বড় ফরয। আর এ ফরযটি একা পালন করা সম্ভব নয় বলেই দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে সংগঠন (জামায়াত) ভুক্ত হওয়া দ্বিতীয় বড় ফরয। এ দুটো ফরয আদায় করার জন্যই কুরআনে জান ও মাল কুরবান করে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যারা নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত পালন করাকেই দীনদারীর জন্য যথেষ্ট মনে করেন এবং দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে কোনো সংগঠনভুক্ত হন না, তারা দীন ইসলামকে একটি ধর্ম মাত্র মনে করেন এবং ধর্মটুকুই পালন করেন। তারা দীন ইসলাম যে পরিপূর্ণ জীবনবিধান, সে বিষয়ে সঠিক ধারণা রাখেন না।

শেষ নবীর গোটা জীবনটাই দীন ইসলামের বাস্তব রূপ। তিনি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে ইসলামের সকল বিধানকে বাস্তবে চালু করেছেন। তাঁর জীবন থেকে শুধু নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাতকেগ্রহণ করা যথেষ্ট মনে করা মুমিনের পরিচায়ক হতে পারে না। রাসূল (স)-এর সাথে জামাআতে নামায আদায়ের পর রাসূলের নির্দেশে সবাই উহুদের যুদ্ধে রওয়ানা হন। কিছু দূর যাওয়ার পর যারা রাসূলের সাথে যেতে অস্বীকার করে ফিরে এল, তারা নামায পড়া সত্ত্বেও মুনাফিক বলে গণ্য হলো। তারা নামাযে রাসূলের সাথী ছিল; কিন্তু দীনকে বিজয়ী রাখার কাজে সাথী হতে রাজি ছিল না। তাদের এ আচরণ

www.priyoboi.com

ঈমানের প্রমাণ দেয় না।

আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে 'একমাত্র সুন্দরতম আদর্শ' বলে ঘোষণা করেছেন। তাই খাঁটি মুমিন রাসূলের প্রধান দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে পারে না। মুমিনের জীবনে দীনকে বিজয়ী করার ভাবনাই প্রধান ভাবনা।

দুনিয়ার মঙ্গল সম্পর্কে মুমিনের ভাবনা

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ـ

'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার মঙ্গল দান কর এবং আখিরাতের মঙ্গলও দান কর।'

এ দু'আর সঠিক মর্ম সবাই বুঝে না। যারা দুনিয়াদার তারা মনে করে যে, দুনিয়ার মঙ্গল হলো দুনিয়ায় যত কিছু ভোগের সামগ্রী রয়েছে তা ভোগ করার সুযোগ; কিন্তু এ বিষয়ে মুমিনের ভাবনা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আখিরাতের মঙ্গল হলো, দোযখ থেকে মুক্তি ও বেহেশত লাভ করা। আর দুনিয়ার মঙ্গল হলো আখিরাতের মঙ্গল হাসিলের জন্য দুনিয়ায় যেভাবে জীবন যাপন করা উচিত সেভাবে চলার সুযোগ ও তাওফীক।

এ বিষয়ে দুনিয়াদার ও দীনদারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুনিয়াদারের নিকট বস্তুগত উন্নতিই জীবনের লক্ষ্য। সব দিক দিয়ে জীবনমান বৃদ্ধি করা এবং মন ভরে জীবনকে উপভোগ করার জন্য রাত-দিন তারা মহাব্যস্ত। এ বিষয়ে হালাল-হারামের কোনো ধার ধারে না। জীবনের মহত্তর কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই।

দীনদাররা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্যকেই জীবনের লক্ষ্য মনে করে। রাসূল (স) দুনিয়া ত্যাগ করা শিক্ষা দেননি বলে মুমিন দুনিয়ার উন্নতির বিরোধী নয়। হালাল পথে চলে যদি আল্লাহর মেহেরবানীতে দুনিয়ার উন্নতি হয়, তাহলে মুমিন আল্লাহর পথে বেশি বেশি খরচ করার সুযোগ পেয়ে খুশিই হয়।

হালাল পথে অর্জিত ধন-সম্পদও আল্লাহর নিয়ামত। এ সম্পদ মুমিনের লক্ষ্য নয়। আখিরাতের লক্ষ্যের জন্য সম্পদ সহায়ক হিসেবে গণ্য।

মুমিনের ভাবনা অনুযায়ী বেঁচে থাকার জন্য সম্পদ অবশ্যই প্রয়োজন; কিন্তু বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য সম্পদ ভোগ করা নয়। দীনই মুমিনের উদ্দেশ্য। দীনের দাবি পূরণ করার জন্যই জীবনকে কাজে লাগাতে হবে। এটাই বেঁচে থাকার মহত্তর উদ্দেশ্য।

সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতে ভালোবাসার পাত্রের দুটো তালিকা দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার ভালোবাসার ৮টি পাত্রের নাম দিয়ে বলা হয়েছে, 'মুমিন হতে হলে এ ৮টির প্রতি ভালোবাসার দায়িত্ব এমনভাবে পালন করতে হবে, যাতে আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদের ভালোবাসার চেয়ে বেশি হয়ে না যায়। এ তিনটির চেয়ে ঐ আটটির ভালোবাসা বেশি হলে ঐ ব্যক্তি ফাসিক বলে গণ্য হবে এবং মুমিনের মান কিছুতেই বহাল থাকবে না।

সবাই বলে, 'পানির অপর নাম জীবন'। কথাটি এ দিক দিয়ে ঠিক যে, পানি ছাড়া জীবন বাঁচে না। কুরআন মাজীদে আছে :

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ـ

'আমি প্রত্যেক জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।' (সূরা আম্বিয়া : ৩০)

কিন্তু এ কথাও তো সত্য যে, মানুষ পানিতে ডুবেও মরে। তাহলে সঠিক কথাটি হলো, এক বিশেষ পরিমাণ পানি জীবন আর এর বেশি পরিমাণ হলে পানিই মরণ। পরিমাণই বড় কথা।

তেমনিভাবে দুনিয়ার ভালোবাসার ৮টি পাত্রের চেয়ে পরের তালিকার ৩টির ভালোবাসা বেশি হলে ঈমানের জীবন; এর বিপরীত হলে ঈমানের মরণ।

মুমিনের বড় ধান্দা হলো, আল্লাহর ব্যাংকে কত বেশি পরিমাণ পুঁজি জমা করা যায়। কারণ, যাকিছু আল্লাহর পথে খরচ

করা হয় তা আল্লাহর নিকটই জমা থাকে। তিনি মেহেরবানী করে তা ধার হিসেবে গণ্য করেন এবং ধার ফেরত দেওয়ার সময় অনেক গুণ বাড়িয়ে দেবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

রাসূল (স) বলেছেন, "মানুষ 'আমার' 'আমার' বলে দাবি করে। কতটুকু তোমার? তুমি যা খেয়ে হজম করেছ (যা হজম না হয়ে বের হয়ে যায় তা অন্য জীবের, তোমার নয়), যা গায়ে দিতে দিতে ছিঁড়ে গেছে এবং যা আল্লাহর পথে খরচ করেছ– এটুকুই শুধু তোমার (বাকি সব ওয়ারিশদের)।"

এ দিকে খেয়াল রেখে মুমিন সাধ্যমতো আল্লাহর পথে খরচের কোনো সুযোগই হাতছাড়া হতে দেয় না। এ খেয়াল থেকেই যখন যা আয় হয় তা থেকে একটা অংশ আল্লাহর পথে বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের বাইতুল মালে দান করে। আয় থেকে দুনিয়ার প্রয়োজনে খরচ করার আগে বাইতুল মালে দিলে আল্লাহ বরকত দেবেন বলে আশা করা যায়। অবশ্য শরীআতমতো পরিবারের জন্য যা খরচ করা হয় তাও সাদাকাহ বলে গণ্য।

প্রশান্তচিত্ত মুমিনের দৃঢ় মনোবল

প্রশান্তচিত্ত মুমিন অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হয়ে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে তার দৃঢ় মনোভাব বিস্ময়কর। তার ভাবনা নিম্নরূপ :

১. আমি আল্লাহর সৈনিক। তিনিই আমার শক্তির উৎস। আল্লাহ, রাসূল (স) ও আল্লাহর পথে জিহাদকে অন্য সব ভালোবাসার পাত্রের চেয়ে বেশি ভালোবেসে আমি পরম তৃপ্ত। আর সব ভালোবাসার পাত্রকে তাঁরই দেওয়া সীমা অনুযায়ী ভালোবাসার চেষ্টা করি।

২. আমার রব, বাদশাহ ও ইলাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তিকে আমি ভয় করি না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَنْ خَافَ اللّٰهَ خَافَهٗ كُلُّ شَىْءٍ وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللّٰهِ خَوَّفَهٗ كُلُّ شَىْءٍ۔

'যে শুধু আল্লাহকে ভয় পায়, তাকে অন্য সবাই ভয় পায়। আর যে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় পায়, তাকে সবাই ভয় দেখায়।'

দীনের দুশমনেরা আমাকে মৃত্যুভয় দেখাতে পারে। তাতে আমার খুশি লাগে। কারণ, আমি তো শহীদ হতেই চাই।

৩. মৃত্যুভয় মানবজীবনের সকল দুর্বলতার উৎস। মৃত্যুকে ভয় করা চরম বোকামি। ভয় করে মৃত্যুকে ঠেকানো বা বিলম্বিত করা সম্ভব নয়। যখন আসার সময় হবে একবারই আসবে। তাহলে ভয় করে লাভ কী? যে মৃত্যুভয় ত্যাগ করতে সক্ষম হয়, তার চেয়ে বেশি সাহসী অন্য কেউ হতে পারে না। যে মৃত্যুকেই ভয় পায় না, সে কোনো আপদ-বিপদেই পেরেশান হয় না।

৪. দুনিয়াকে মুমিন স্থায়ী বাসস্থান মনে করে না। দুনিয়া কর্মক্ষেত্র মাত্র। রাসূল (স) বলেন,

اَلدُّنْيَا دَارٌ مَّنْ لَّا دَارَ لَّهٗ وَلَهٗ يَجْمَعُ مَنْ لَّا عَقْلَ لَّهٗ ۔

'যার কোনো বাড়ি নেই, দুনিয়া তারই বাড়ি এবং এ দুনিয়ার জন্য যারা জমা করে তাদের আকল নেই।

মুমিন দুনিয়ার আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করতে সক্ষম হয়। জান্নাতের চিরস্থায়ী বাসস্থানের লোভ দুনিয়ার যাবতীয় অবৈধ লোভ ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৫. মুমিন মানসিকভাবে সব সময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত থাকে। কারণ, মৃত্যু যেকোনো সময় হাজির হতে পারে। মুমিন মৃত্যুর আগমনে অপ্রস্তুত হয় না। মৃত্যু মুমিনের কাম্য। কারণ, প্রিয়তম মাবুদের সাথে মিলিত হওয়ার এটাই একমাত্র পথ।

এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, দুনিয়া আমার মোটেই ভালো লাগে না, তাই আমি মৃত্যু চাই। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে নিম্নের দু'আ শিক্ষা দিলেন :

www.priyoboi.com

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ -

'হে আল্লাহ! যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক ততদিন আমাকে জীবিত রাখ। আর যখন মৃত্যু আমার জন্য মঙ্গলজনক তখন আমাকে মৃত্যু দিও।'

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শেখানো আরেকটি দু'আ নিম্নরূপ :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ -

'হে আল্লাহ! যতদিন বেঁচে আছি, বেশি বেশি নেকী কামাই করার তাওফীক দাও এবং মৃত্যু যেন আমাকে সকল মন্দ থেকে রেহাই দেয়।'

যা অর্জন করা মুমিনের টার্গেট

১. আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের স্থায়ী চেতনা।
২. রাসূল (স)-এর সাথে মহব্বতের আবেগময় গভীর অনুভূতি।
৩. কুরআন অধ্যয়নের নেশা।
৪. জীবন্ত নামাযের স্বাদ গ্রহণের তৃপ্তিবোধ।
৫. দাওয়াতে দীনের অব্যাহত প্রচেষ্টা।
৬. আল্লাহর ব্যাংকে একাউন্ট বৃদ্ধির ধান্দা।
৭. শাহাদাতের জযবা– মৃত্যুভয় থেকে মুক্তি।

সমাপ্ত

www.priyoboi.com